n দোলনচাঁপা ভট্টাচার্য

“ভাঙার নেশায় ভাঙছে নদী ভাঙছে গাঁয়ের বুক
ভাঙতে ভাঙতে পাল্টে যাচ্ছে তোমার দেশের মুখ”

ভাঙনের এই মুখ শহরের নয়। এই মুখ বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের। বছর কয়েক আগে ভাঙন বিধ্বস্ত মালদার জনাকয়েকের সঙ্গে আলাপচারিতার পর এই লাইনক'টি কলমবন্দি করেছিলেন সংগীতকার কবীর সুমন। তড়িকুল ইসলাম, কেদার মণ্ডলদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজের দূরদর্শী অনুভবে ভয়ানক একদিনের অশনিসংকেত লক্ষ করেছিলেন নাগরিক কবিয়াল। সেই আশঙ্কা সত্য এতদিনে। কারণ, আবার ভাঙছে মালদা। শুধু ভাঙছে বললে ঘটনার গুরুত্ব খর্ব করা হয়। বরং বলা ভাল, বিধ্বংসী এক পথে এগোচ্ছে গঙ্গা। বদলে যাচ্ছে পুরো মালদা জেলার মানচিত্র। একই সঙ্গে এই রাজ্যেরও। বাস্তবে পশ্চিমবঙ্গের বিপুল পরিমাণ জমি চলে যাচ্ছে ঝাড়খণ্ডে। জেলাশাসক বলেছেন, এখানে তাঁর কিছু করার নেই। বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্তরে দুই রাজ্যের আলাপচারিতায় মিটিয়ে নিতে হবে। দুই রাজ্যের আলাপচারিতা এখনও বিশ বাঁও জলে, এদিকে নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখে প্রকৃতির নিয়মকানুন বদলে দিয়ে গঙ্গাবক্ষে বিলীন হয়ে গিয়েছে বিহারিটোলা ও বীরনগর এলাকার বেশ কিছু অংশ। সাধারণত নদীর দু'পারে ভাঙন হয় জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর মাসে। নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে নদীর সর্বগ্রাসী রূপ দেখা যায় না বড় একটা। স্বভাবতই, এই সময়ে ভাঙন নিয়ে মাথা ঘামান না প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কর্তারা। সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এ নদী সংক্রান্ত ফেলোশিপ করার সময় অন্তর্তদন্তে উঠে এল এই সব তথ্য। বিহারিটোলা ও বীরনগরের একটা বড় অংশ যখন জলের তলায় চলে যাচ্ছে, তখন দফতরে বসে মালদার জেলাশাসক চিত্তরঞ্জন দাস বলেছেন, “এই সময়ে তো নদী শান্ত থাকে! এখন আবার ভাঙন কোথায়? ও তো খানিকটা মাটি ধসে পড়া। ভাঙন দেখতে হলে জুলাই-অগস্টে আসুন। অবশ্য এখন তো আর জেলায় তেমন বিধ্বংসী ভাঙন হচ্ছে না। যা হয়েছিল, তা তো ২০০৫ এর সেপ্টেম্বরে, পঞ্চানন্দপুরে।” বড় আকারের ভাঙন না হয় হচ্ছে না, কিন্তু নদীর গতিপথ বদলের খবর কি জানা আছে জেলা প্রশাসনের? প্রশাসকেরা কি জানেন, ক্রমশই সক্রিয় হয়ে উঠছে গঙ্গার ‘মিড চ্যানেল’? পরিণামে বদলে যেতে পারে নদীর গতিপথ, বদলে যেতে পারে রাজ্যের ভূগোল, বিপন্ন হতে পারে সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি লক্ষ লক্ষ মানুষ।

মালদা-মুর্শিদাবাদের ভাঙন নিয়ে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন অভিজ্ঞ নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র। তিনি বলেছেন, “রাজমহলের দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে মানিকচক ঘাটে এসে গঙ্গা দু'টি পথে বয়ে গিয়েছে। একটি পঞ্চানন্দপুরের দিকে, অন্য শাখাটি মিড চ্যানেল বলে পরিচিত। সেই শাখা নদীখাতে গজিয়ে ওঠা এক চরের মাঝখান দিয়ে বয়ে পঞ্চানন্দপুরের দক্ষিণে ফের গঙ্গার মূলস্রোতে মিশেছে। গঙ্গার আরও দুটি ধারা যথাক্রমে ১৯ নম্বর চ্যানেল ও উদুয়ানালা নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে একইভাবে ফরাক্কা ব্যারেজের উজানে এসে মিশেছে গঙ্গার মূলস্রোতে। ২০০৬ সাল থেকেই এই মিড চ্যানেল ক্রমশ সক্রিয়। নদী এ পথে এভাবে এগোলে আশঙ্কা হয়, অদূর ভবিষ্যতে গঙ্গা একদিন শিমুলতলা থেকে পূর্বদিকে বাঁক নিয়ে নতুন পথ করে নেবে। এড়িয়ে যাবে ফরাক্কা ব্যারেজের শৃঙ্খল। ২০০৭-এর বর্ষায় শিমুলতলার ভাঙন তারই ইঙ্গিতবাহী। নদী এভাবে গতিপথ বদলালে ফরাক্কা ব্যারেজ তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে।” তাঁর ধারণা, এর ফলে বিপন্ন হবে মালদা শহরের অস্তিত্ব। কারণ, গঙ্গা যদি একবার ছোট ভাগীরথী ও পাগলার সঙ্গে বইতে শুরু করে তবে মহানন্দাও বাদ যাবে না। শহরের মাঝখান দিয়ে গঙ্গার বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একই আশঙ্কা করছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। ২০০১-এর ২ জুলাই এক চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীকে এই আশঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। গঙ্গা যে গতিপথ বদলাচ্ছে, একথা বলার জন্য কিন্তু নদী বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। গঙ্গা ভাঙন অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি কেদার মণ্ডল বা ভুতনির চরের অশীতিপর রোহিনী সরকার, প্রত্যেকে এই মুহূর্তে নদীর গতিপথ বদল নিয়ে আশঙ্কিত। কেদার মণ্ডলের কথায়, “এ বছর সবচেয়ে বেশি ভাঙন হয়েছে ডোমহাটায়। সেখানে নদীখাতের গভীরতা বেড়েছে। তাতে মনে হয়, মিড চ্যানেল এখন সক্রিয়। প্রায় ছয়-সাত দশক ধরে নদী নিয়ে ঘর করার কারণেই জানি, ঠিক এভাবে সক্রিয় হতে হতেই একটা সময় পঞ্চানন্দপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে গ্রাস করেছিল গঙ্গা। আর এসবের জন্য দায়ী ফরাক্কা ব্যারেজ।” নদীর অস্বাভাবিক ভাঙনের জন্য ব্যারাজকেই দায়ী করছেন নদীপাড়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ।

ফরাক্কা ব্যারাজের পরিকল্পনা, রূপায়ণ নিয়ে বহু রকমের বিতর্ক ও মতবাদ চলে আসছে বিগত কয়েক দশক ধরে। জনশ্রুতি, স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের অন্যতম বিতর্কিত এই নদী বাঁধের পরিকল্পনার পিছনে নাকি ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তানের সরকার নাকি পূর্ব পাকিস্তানকে খানিকটা কোণঠাসা করতেই ব্যারেজ তৈরির পরিকল্পনায় ভারত সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন, এর ফলে জল কম পাবে পূর্ব পাকিস্তান। তবে অনেকেই এই মত মানেন না। সকলে একটি বিষয়ে একমত। তা হল, হুগলি নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও কলকাতা বন্দরকে আরও সচল করে তোলার উদ্দেশে ১৯৭৫ সালে যে প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছিল, তার ফলে আদতে লাভ হয়নি কিছু। কারণ, ১৯৭৫ সালে ব্যারেজ চালুর বহু আগেই ভাগীরথী নদী গঙ্গার মূলস্রোত থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তখনও কলকাতা বন্দরের জন্ম হয়নি। ১৬৬৬ সালে ফরাসি পরিব্রাজক ট্যাভারনিয়ারের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সুতিতে গঙ্গার উৎসমুখটি তখনই পলি আর বালিতে রুদ্ধ।

এর পরে গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। ১৮৫৩ সালে স্যার আর্থার কটন ও পরে ১৯৫৭ সালে এ দেশে আমন্ত্রিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নদীবিজ্ঞানী ডব্লিউ হেনসেন ও জে জে ড্রনকার্স ফরাক্কায় গঙ্গার উপর ব্যারাজ তৈরির পরামর্শ দেন। ১৩ বছর প্রযুক্তিবিদদের দীর্ঘ সংগ্রামে গঙ্গাকে অবশেষে বেঁধে ফেলা সম্ভব হল। আশ্বাস দেওয়া হল, সেখান থেকে শুখা মরসুমে ৪০ হাজার কিউসেক জল ভাগীরথী-হুগলিতে প্রবেশ করানো হবে। জাহাজ চলাচলের পথে সব পলি ধুয়ে যাবে সাগরে। তবে আশ্বাসই সার, বন্দরে নাব্যতার সমস্যা রয়েছে আজও। কারণ বদলে গিয়েছে নদী অববাহিকার চরিত্র। একাধারে অববাহিকার উজানে সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জলের জোগান, অন্যদিকে চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে জল সরবরাহ, এই দুইয়ের টানাপোড়েন কলকাতা বন্দরের প্রাপ্য জল এখন বাড়ন্ত, বিশেষত শুখা মরশুমে। ১৯৯৬ সালে ভারত-বাংলাদেশ জলবন্টন চুক্তির পর দলীয় পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই তথ্য দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী

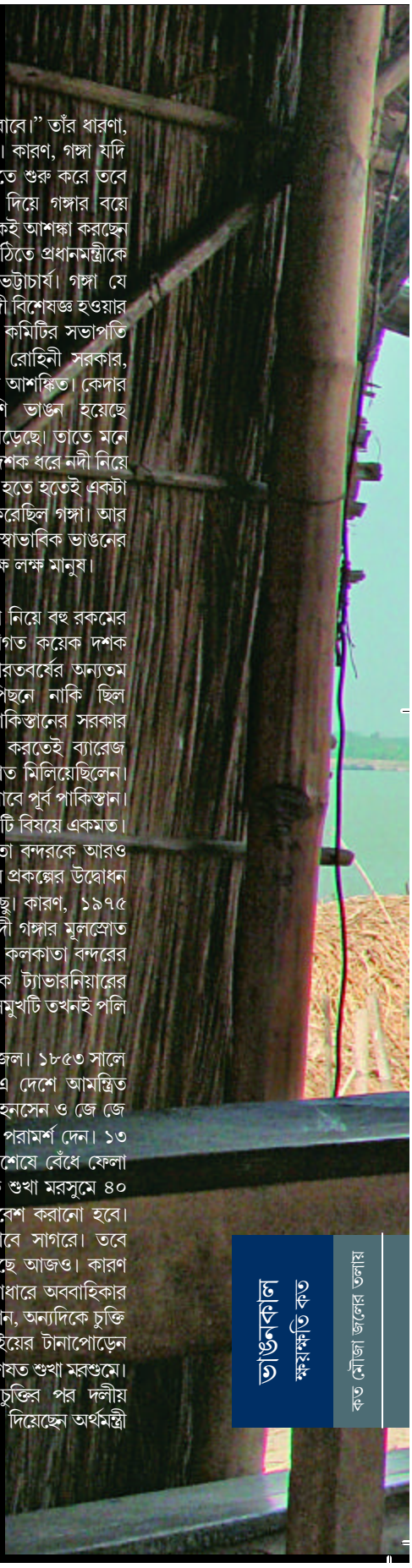

ফোটো: কল্যাণ রুদ্র

গঙ্গার ভাঙনে রাজ্যের

নদী গতিপথ বদলানোয় কেবল লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপন্ন হননি, নতুন জেগে ওঠা চরগুলি অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে পাশের রাজ্যে। বদলে যাচ্ছে গোটা জেলার মানচিত্রটাই। তা নিয়ে অবশ্য বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই প্রশাসন বা রাজনৈতিক মহলেরর

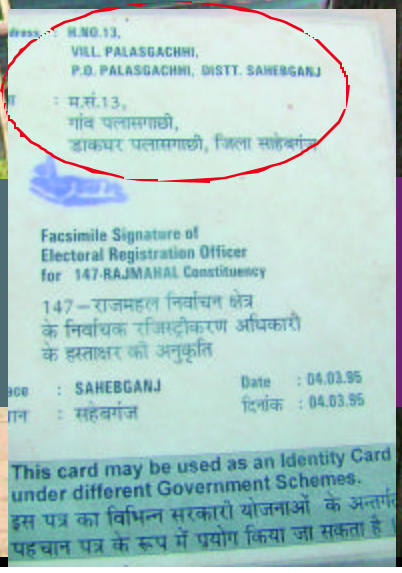

৬৪টি মৌজা

কালিয়াচক-১, কালিয়াচক-২ মাণিকচক ব্লকে জলের তলায়

৩০০ কোটি টাকা

এখনও পর্যন্ত ভাঙন প্রতিরোধের জন্য ব্যয় করা হয়েছে

৪০ কিলোমিটার

উজানে ও ৮০ কিলোমিটার ভাটিতে কাজ করছে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ

পাল্টে যাচ্ছে পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গ না ঝাড়খণ্ড

পলাশগাছি মৌজার বাসিন্দা সেনারুল শেখ। ২০০১ সালের সেন্সাসে বলা হয়েছে পলাশগাছি মালদা জেলার অন্তর্গত। যদিও, সেনারুলের ভোটার কার্ডে তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার বাসিন্দা হিসেবে। এতে প্রমাণিত হয় জমি হাতছাড়া হচ্ছে রাজ্যের

ভোটব্যাঙ্ক নেই, উদাসীন শাসক

দুই রাজ্যের সীমারেখা সংবিধান নির্ধারিত, অথচ মালদার জেলাশাসক সে কথা মানতে রাজি নন

রাজ্যের মানচিত্র বদলে যাচ্ছে, আর প্রশাসকেরা কী করছেন? ঝাড়খণ্ড কার্যত পশ্চিমবঙ্গের জমি দখল করছে আর মালদা জেলা প্রশাসনের সর্বময় কর্তা, জেলাশাসক চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছেন, "চরের জমি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। ওই জমি ঝাড়খণ্ডের না এ রাজ্যের তা এখনও মীমাংসা হয়নি। এ কারণেই চরে ন্যূনতম পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারছি না। আসলে কোনও নদী যদি দু'রাজ্যের সীমারেখা হয়, তা হলে সীমারেখা স্থির থাকতে পারে না।" অথচ সংবিধানে দুই রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আবার ম্যাপেও দেখা যাচ্ছে নানা উল্টোপাল্টা তথ্য, অসঙ্গতি। দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা 'ন্যাশনাল অ্যাটলাস থিমেটিক ম্যাপিং অর্গনাইজেশন' এবং 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'-র প্রকাশিত মানচিত্রে মালদার কয়েকটি অংশকে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলে দেখানো হয়েছে। ১৯৪৬ এ প্রকাশিত সার্ভে অফ ইন্ডয়ার ৭২ (পি/১৩) নম্বর মানচিত্রে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা হিসেবে গঙ্গাকেই ধরা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৭০-৭১ সালের জরিপের ভিত্তিতে প্রকাশিত মানচিত্রে একটি ফুটনোটে বলা হয়েছে, "গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে বিহার-পশ্চিমবঙ্গ ও মালদা-মুর্শিদাবাদের সীমান্তকে প্রামাণ্য ধরা হবে না।" সম্প্রতি সার্ভে এফ ইন্ডিয়া মালদা জেলার যে মানচিত্রটি প্রকাশ করেছে তাতেও বলা হয়েছে, "সাহেবগঞ্জ জেলার সীমানাটি প্রামাণ্য নয়।" আবারও সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি। এ বার একধাপ এগিয়ে ন্যাশনাল অ্যাটলাস। তারা সাহেবগঞ্জ জেলার মানচিত্রটাই প্রকাশ করেছে সেখানে সমগ্র চর এলাকাকেই ঝাড়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে। আর এসবের সুযোগ নিয়েই এ রাজ্যের জমি বেহাত হয়ে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। লাল ফিতের ফাঁসবন্দি ফাইলের কথা বলে দায় এড়াচ্ছেন জেলাশাসক। কিন্তু জনগণের সমর্থনে জিতে আসা জনপ্রতিনিধিরা কীভাবে এড়িয়ে যাবেন এই দায়? ঘটনাচক্রে বর্তমানে রাজ্যের পরিষদীয় ও পরিবেশ দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন মালদা জেলার বিধায়ক ও সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা শৈলেন সরকার। ঝাড়খণ্ডের হাতে এ রাজ্যের জমি চলে যাওয়া ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্দশার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করছেন তিনি। তিনি বলেছেন, "লাগাতার দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ও প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে এই সমস্যা সমাধানের জন্য বহুবার দরবার করেছি। সমস্যা সমাধানে এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারছি না আমরা। কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপে দু'রাজ্যকে নিয়ে বৈঠকে বসা দরকার।" প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ও প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অবশ্য যোগাযোগ করা যায়নি।

রাজ্য সরকারের এভাবে দায় এড়িয়ে যাওয়ার পিছনে অবশ্য অন্য অঙ্ক দেখছেন জেলার ভাঙন বিধ্বস্তদের একাংশ। পঞ্চনন্দপুরে বাস্তুহীন হয়ে পড়া তড়িকুল ইসলাম, মৌলবী সাহেব, রুবিউল রহমানেরা অকপটে জানাচ্ছেনও সেকথা। তড়িকুলের সোজাসাপটা বক্তব্য, "বিগত কয়েক বছর ধরে 'গঙ্গা ভাঙন অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটি-র ব্যানারে আন্দোলন চালাচ্ছি। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝলেও তা নিয়ে কোনও কিছু করার অভিপ্রায় নেই বর্তমান রাজ্য সরকারের। কারণ, এখানে চরে যাঁরা বাস করেন, তাদের অধিকাংশই কংগ্রেসি ভোটার। গনিখানের নামই জানা রয়েছে এদের।" পঞ্চানন্দপুরবাসীর এই বক্তব্য সমর্থন করছেন জেলার কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী বা ডালু মিঞা। তাঁর দাবি, "সিপিএম জানে ওই চরের বাসিন্দাদের কেউ তাদের ভোটার নন, এ কারণেই ওদের নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারও।" যদিও এইসব অভিযোগ "ধোপে টেকে না" বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন শৈলেন সরকার। রাজনৈতিক নেতাদের এই চাপানউতোরের মাঝখানে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষেরা লড়াই চালাচ্ছেন অন্য এক অধিকার অর্জনের। এ অধিকার রায়তি জমির অধিকার।

কল্যাণ রুদ্রের সৌজন্যে

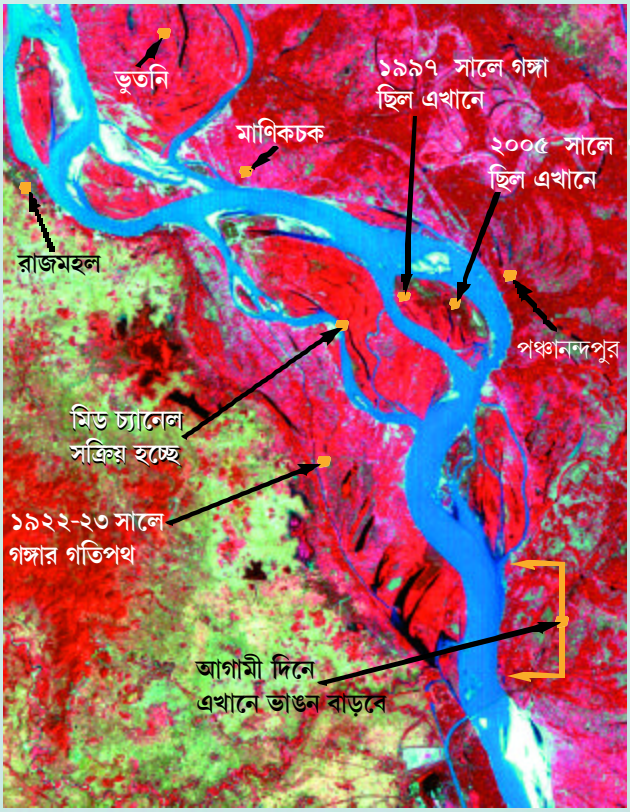

সূত্র: এ ডব্লিউ এফ এস উপগ্রহ চিত্র, ডিসেম্বর, ২০০৬

> "সিপিএম জানে ওই চরের বাসিন্দাদের কেউ তাদের ভোটার নন। এখানকার লোকজন শুধু বরকত সাহেবকে চেনে। এ কারণেই ওদের নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারও।"
>
> আবু হাসেম খান চৌধুরী, সাংসদ

অসীম দাশগুপ্ত স্বয়ং। অর্থমন্ত্রীর মন্তব্য অবশ্য নস্যাৎ করে দিয়েছে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার নরেশকুমারের দাবি, “কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে আমরা কাজ করছি। এই তো এ বছরও ফরাক্কায় নদীতে সর্বোচ্চ জলস্তর ছিল ১৬ লক্ষ কিউসেক।” কিন্তু শুখা মরসুমেও কি অত জল থাকে? এ বার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন নরেশ কুমার। কল্যাণ রুদ্রের মতে, “আসলে ফরাক্কা ব্যারেজের মূল সমস্যা হল, ৪০ হাজার কিউসেক জল ৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীপথে সব পলি ধুয়ে সাগরে ফেলবে, এমন ধারণার মধ্যে আবেগ ছিল, বিজ্ঞান ছিল না। মনে রাখতে হবে জোয়ারের স্রোত যে পরিমাণ জল নিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়, উজানের দক্ষিণমুখী স্রোত তার তুলনায় নগণ্য। দুইয়ের অনুপাত ১৬০:১।” এ বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন চিফ হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার তপোব্রত সান্যালের গবেষণা নিবন্ধে। সেখানে তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, “ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের পর কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টকে আগের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ পলি ড্রেজিং করে তুলতে হয়।”

সকলেই বলছেন, ব্যারেজ তৈরির পরেও ড্রেজিং করে গঙ্গা থেকে পলি তুলতে হচ্ছে, অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরি হয়েছিল তার ফল মেলেনি। কিন্তু ব্যারেজের জন্য নদীর গতিপথে, তার আশপাশে প্রতিক্রিয়া হয়েছে সুদূরপ্রসারী। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ব্যারেজের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একদা ফরাক্কার মুখ্য বাস্তুকার প্রণব কুমার পারুয়া। তাঁর দাবি, “ফরাক্কা ব্যারেজের ফলে গঙ্গার গতির ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটেছে, ভাঙন ও প্লাবন বেড়েছে, ব্যারেজের উজানে জমে গিয়েছে বিপুল পরিমাণ পলি।” প্রসঙ্গত, ভাঙনের জন্য ফরাক্কা ব্যারেজকে দায়ী করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজেদের বক্তব্য পেশ করেছেন সেচ ও জলসম্পদ দফতরের এক স্ট্যান্ডিং কমিটিও। ২০০৪-এ বিধানসভায় পেশ করা রিপোর্টে ফরাক্কা ব্যারেজকে দায়ী করা হয়েছে গঙ্গার ধ্বংসলীলার জন্য।

“চরে কোনও পরিষেবা নেই। প্রশাসন মাথাও ঘামায় না। ওদের কথা ভুলেই গিয়েছে রাজ্য”

আবু হাসেম খান চৌধুরী, সাংসদ (উপরে বাঁদিকে)

“কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমরা তো সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানিয়েছি”

শৈলেন সরকার, পরিবেশ মন্ত্রী (উপরে ডানদিকে)

“ফরাক্কা বাঁধের পরিকল্পনায় আবেগ ছিল, ছিল না বিজ্ঞান। তারই মূল্য দিতে হচ্ছে লক্ষ মানুষকে”

কল্যাণ রুদ্র, নদী বিশেষজ্ঞ (নীচে বাঁ দিকে)

“ভাঙন বাঁচাতে নির্ধারিত সীমার বাইরে ব্যারেজের দু’পাশে আমরা কাজ শুরু করেছি”

নরেশ কুমার, ফরাক্কা ব্যারেজ (নীচে ডান দিকে)

ব্যারেজ নিয়ে তত্ত্বকথার এই কচকচানিতে বিন্দুমাত্র আমল দিতে রাজি নন মালদার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ। কালিয়াচক এক, কালিয়াচক দুই ও মানিকচক ব্লকের ১ লক্ষ ২০ হাজারের মতো মানুষ বারে বারে বাসা বদলেছেন, গঙ্গা প্রতিবার নতুন করে তাঁদের ঠাঁইটুকু কেড়ে নিয়েছে। আসলে তাঁরা এমন এক রাজ্যের বাসিন্দা যেখানে ‘নেই’ শব্দটিই একমাত্র বাস্তব। নদীর বুকে চরের উপরে গজিয়ে ওঠা, পলাশগাছি, খাটিয়াকানা, ঘানুটোলা, বানুটোলা, খাটিশটোলা, কলকাতা বাজারের মতো নতুন জনপদে না আছে স্কুল, না আছে চিকিৎসা কেন্দ্র। প্রতি দিনের অন্নসংস্থান করতে ১০ টাকা মজুরির উপরে ভরসা করে থাকতে হয় খাটিয়াকানার মহম্মদ আক্রামুল, ঘানুটোলার বিরনাহার বিবি, জোৎস্না মণ্ডলদের। চার-পাঁচটি সন্তানের মুখে দু’বেলা দু’মুঠো তুলে দেওয়ার জন্য নদীর কোনও জনমানবহীন চরে ঘাস কাটতে যান জোৎস্নারা। সেই ঘাসই ১০ টাকা দরে বিক্রি হয়। যে সব চর মূল ভূখণ্ড থেকে কাছে সেখানে গজিয়ে ওঠা গ্রামগুলিতে অবশ্য ১০০০টি বিড়ি বেঁধে ৩০ টাকা মজুরি জোটে আক্রামুল, জাহিরা বিবিদের।

মিড চ্যানেলের কাছে কলকাতাবাজার নামক এক চরে দরমা ঘেরা ঘরের দাওয়ায় দুই মেয়ে, কোলের ছেলেটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সন্তানসম্ভবা এক মহিলা। নাম নাজেমা বিবি। কোলের ছেলেটির হাতে বাঁকাচোরা থালায় লঙ্কাবাটা দিয়ে মাখা কয়েকদলা ভাত। দুধের শিশুকে এভাবে লঙ্কাবাটা দিয়ে ভাত দিয়েছেন কেন? বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর জবাব মিলল, “আর কী দেব! চরে পটল, শশা, লঙ্কা ছাড়া আর কিছু ফলন হয় না। আগে যখন উর্বর পলি ছিল, তখন ধান, গম, পাট সবকিছুর ফলন হত। এখন সেসব হয় না। এই যে জুটছে, সেই ভাল। ১০-১২ বার ঘর পাল্টেছি। বেঁচে আছি সে কি কম ভাগ্যি!” অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় চিকিৎসা হয় কোথায়? নাজেমা বলছেন, “এইগ্রামে কেউ অসুস্থ হলে তাকে খাটিয়ায় চাপিয়ে প্রথমে হাঁটা পথে নিয়ে যেতে হয় অনেকখানি। এর পর নৌকা করে নদী পেরিয়ে তবেই পঞ্চানন্দপুরে বাঙ্গিটোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছানো যায়। তেমন বাড়াবাড়ি হলে ছুটতে হয় কোয়াকের কাছে।” প্রসঙ্গত, নদীর প্রতিটি চরেই অসংখ্য হাতুড়ে ডাক্তারের উপস্থিতি বেশ চোখে পড়ে। রোগবালাইয়েরও অভাব নেই। অধিকাংশ চরের পুরুষেরা কাজের জন্য দিল্লি, মুম্বই পাড়ি দেয়। এদের অনেকেই ফেরার সময় সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে আসেন জ্বর। সেই জ্বর সহজে ছাড়তে চায় না। বলাই বাহুল্য, মারণ রোগের এই জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে অনেক পরিবারে। চরে রয়েছে নিরাপত্তার অভাব। খাটিয়াকানা চরের বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব ল্যাচন বিবি বলছেন, “মাঝে মাঝেই চরে ডাকাতেরা হানা দেয়। লুঠপাট করে নিয়ে যায় সব। এখানে তো কোনও থানা-পুলিশ নেই।” বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, চর থেকে কোনও সমস্যা নিয়ে নদীর ওপারে কালিয়াচক ব্লকের অন্তর্গত মোথাবাড়ি থানায় যোগাযোগ করলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, এই এলাকা পশ্চিমবঙ্গের নয়, ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত।

নয়া আইনে বিপর্যয় চরবাসীর

এখন নতুন জেগে ওঠা চরের মালিকানা পাচ্ছেন না ক্ষতিগ্রস্তেরা

ফোটো: কল্যাণ রুদ্র

চরের বারমাস্যা: সম্বল একটিমাত্র শাড়ি, গায়ে দিয়েই তা রোদে শুকিয়ে নেওয়া

ফোটো: কল্যাণ রুদ্র

শিশুখাদ্য: দুধের বাচ্চার জন্য দুধ নেই, সম্বল লঙ্কাবাটা দিয়ে ভাত

প্রকৃতির নিয়মেই নদীর এক পাড় যখন ভাঙে, তখন অন্যপাড়ে গজিয়ে ওঠা চরে নিজের হারানো জমি খুঁজে পান নদীপাড়ের বাসিন্দারা। নিজেদের মধ্যে এই জমিবণ্টন সেরে ফেলেন রায়তেরা। এ পর্যন্ত মালদার নদীপাড়ের মানুষও অভ্যস্ত ছিলেন এই নিয়মে। পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন (১৯৫৫) এর ১১ (২) ধারায় বলা হয়েছিল, ভাঙনে হারিয়ে যাওয়া জমি অনধিক ২০ বছরের মধ্যে ওপারে জেগে উঠলে রায়তের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে। তবে ২০০০ থেকে এই ধারাটি তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। তার পরিবর্তে ১২ নম্বর ধারা প্রযোজ্য হয়েছে। এই ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'নদীর মধ্যে যদি কোনও জমি জেগে ওঠে তবে তা রাজ্য সরকারের খাসজমি হবে এবং তার মালিকানা সত্ত্ব রক্ষা করতে পারবে না রায়তদার।' এই নতুন আইন ভাঙনে সব হারানো মানুষের জীবনে বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

এই আইনের ফলে নিজের জমির খাজনা দিতে গিয়ে জেলাশাসকের দফতর থেকে "বিরক্ত না করার" নির্দেশ পাচ্ছেন নদীপাড়ের লাখো মানুষ। বছর কয়েক আগে পঞ্চানন্দপুর গিয়ে ভাঙন বিধ্বস্ত সর্বহারাদের তাদের রায়তি জমি ফেরৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন ভূমি রাজস্ব দফতরের মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা হল কই? মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানাচ্ছেন, "১২ নম্বর ধারায় সংশোধনী না আনা পর্যন্ত ওই এলাকায় কিছু করা যাবে না।" তবে মন্ত্রী স্বীকার করছেন যে জমি নিয়ে টালবাহানার এই সুযোগকে কাজে নাগিয়ে বেহাত হয়ে গিয়েছে রাজ্যের ২০-২১টি মৌজার জমি। যা চলে গিয়েছে ঝাড়খণ্ডের হাতে।

২০০৫-এ পঞ্চানন্দপুরে বিধ্বংসী ভাঙনের পর অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত এলাকা ঘুরে ৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তবে সেই ৩ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র এ যাবৎ এক কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এ তথ্য জানাচ্ছেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি গৌতম চক্রবর্তী। তিনি বলছেন, "জেলাশাসকের দফতরের তরফে দাবি করা হচ্ছে টাকা দেওয়ার নাকি লোক পাওয়া যাচ্ছে না।" টাকা বণ্টন না করার জন্য সরকারি নির্দেশিকার কথাই বলছেন জেলাশাসক। তাঁর বক্তব্য, "টাকা বণ্টনের জন্য সরকারি যে নির্দেশিকা রয়েছে তাতে ভাঙন বিধ্বস্ত পরিবার পিছু ৫০০০ টাকা বরাদ্দ। তবে তা সরাসরি প্লাবিত লোকের হাতে পৌঁছবে না। নিয়ম হল, যাঁর জমি আছে, তিনি ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তকে দুই কাঠা জমি দিলে সরকার থেকে জমির মালিককে দেওয়া হবে পাঁচ হাজার টাকা। এ পর্যন্ত ৩২৬১ জনকে মোট এক কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।" জেলা পরিষদের সভাধিপতি গৌতম চক্রবর্তীর প্রশ্ন, "লক্ষ লক্ষ মানুষ ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত, অথচ মাত্র ৩২৬১ জন ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন কেন? ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে খুঁজে বার করার দায় তো প্রশাসনেরও। খবর আছে, বহু লোক ক্ষতিপূরণ চেয়েও পাচ্ছেন না।"

নিন্দুকেরা বলে, মালদা-মুর্শিদাবাদে নদীর ভাঙন নাকি অনেককে অর্থবান করে তুলেছে। আসলে ভাঙনের মতো বার্ষিক উৎসবকে মূলধন করেই যে মোটা অঙ্কের দাঁও মারা যায়। প্রমাণ, ১৯৯৯ সালের মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার ক্যাগ রিপোর্টে। সেখানে পাড় বাঁধানোর কাজে টাকা তছরূপের কথা বলা হয়েছে। পরিষ্কার ইঙ্গিত করা হয়েছে, রাজ্য সেচ দফতরের কর্মকাণ্ডের দিকেও। সুলতানটোলার গোলনাহার বিবি বলছেন, "ফি বছর বর্ষা আসতেই নদীর পাড় কন্ট্রাক্টার, ঠিকাদার, বোল্ডার মাফিয়াদের দখলে চলে যায়। তবে বছরতিনেক ধরে এই পরিস্থিতির বদল হয়েছে। কারণ এখন নদীপাড় বাঁধানোর কাজ করছে ফরাক্কা ব্যারাজ কর্তৃপক্ষ। আগের তুলনায় ভাল কাজ হচ্ছে। এতে ভারী গোঁসা হয়েছে ইরিগেশন বাবুদের।" গোঁসার আঁচ পাওয়া গেল মালদা জেলা সেচ দফতরের মুখ্য বাস্তুকার সৌমেন মিশ্রের সঙ্গে কথা বলার সময়ে। তিনি দাবি করেছেন, "গত ৫০ বছর ধরে আমরা নদীপাড়ে ভাঙন রোধে কাজ করছি। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ এখন মানিকচক ঘাটে কাজ শুরু করেছে। তা নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত। এমনিতেই ওই অঞ্চলে আগামী ১৫ বছরে গঙ্গার ভাঙন হওয়ার কথা নয়।" তবে যে নদী বিশেষজ্ঞেরা এই ভাঙনে প্রমাদ গুনছেন? সৌমেন মিশ্র বলছেন, "ওসব ননটেকনিকাল কথা। মিড চ্যানেল নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।" সেচ দফতর না ভাবলেও এ নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় রয়েছে ফরাক্কা ব্যারাজ কর্তৃপক্ষ। জেনারেল ম্যানেজার নরেশ কুমার বলেছেন, "উজান ও ভাটিতে যথাক্রমে ৪০ ও ৮০ কিমি কাজ শুরু হয়েছে। তবে এই কাজ অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। তাই যেখানে আপদকালীন ভিত্তিতে কাজ করা দরকার সেখানেই জোর দেওয়া হচ্ছে। আমরা জোর দিচ্ছি মানিকচক ঘাট সংস্কারের উপর। কারণ, মিড চ্যানেলের গভীরতা বাড়ছে।" তার মানে কি ব্যারাজের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তিত আপনারা? এবার কোনও মন্তব্যে নারাজ নরেশ কুমার।

ফরাক্কা ব্যারাজ নিয়ে তৈরি হওয়া বাদ-বিসম্বাদ চলে আসছে গত তিন দশক ধরে। সমস্যা সমাধানে কত যে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে, সেমিনার হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এমনকী রাজ্যের ও কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপে দু'বার দুটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও গঠিত হয়েছে। পাল্টে যাওয়ার ভূ-প্রকৃতির কথা বিবেচনা করে গুচ্ছ সুপারিশ করেছেন এই দুই বিশেষজ্ঞ কমিটির কর্তারা। সুপারিশে কেউ আমল দেননি। ইতিমধ্যেই, মালদা শহরকে বাঁচাতে গঙ্গার তিনটি শাখানদী কালিন্দ্রী, পাগলা ও ছোট ভাগীরথীর উৎসমুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বলিপ্রদত্ত লক্ষাধিক মানুষ। রাষ্ট্রহীন, রাজ্যহীন এই মানুষের অস্তিত্বের সংকট নিয়ে নাগরিক কবিয়াল বলেছেন,

"মুখ ভেঙেছে বুক ভেঙেছে ঘর ভেঙেছে নদী
ভাঙছে তোমার আমার মাটি দেখতে পেতে যদি।"

এই আর্তনাদ কি শুনছেন কেউ? n